মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পদ্মানদীর

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে মানিক আরেক ধাপ এগিয়ে এসেছেন। তিনি এখানে পদ্মানদীর মাঝি ও জেলেদের শরিক। অখ্যাত জনের নির্বাক মনের কবি। রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষিত মানুষ। এই পদ্মানদী এবং তার তীরবর্তী মানুষদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথও গল্প রচনা করেছেন তবে সেখানে মানুষগুলোর অন্তর্লোকের রহস্যই গুরুত্ব লাভ করেছে। মানিকের উপন্যাসে কিন্তু গুরুত্ব পেয়েছে পদ্মানদীর মাঝিদের প্রত্যক্ষ অন্তরঙ্গ বাস্তব বিবরণ। এই উপন্যাসেই মানিক তাঁর প্রস্তুতি পর্বকে অতিক্রম করে স্বকীয়তা অর্জন করেছেন। মেহনতী সর্বহারা জীবনের বাস্তব কাহিনি রচনা করে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্টতা লাভ করলেন। সাধারণ সর্বহারা মানুষের প্রতি তাঁর গভীর দরদ, মমত্ব ও সহানুভূতিবোধ কাহিনিকে এত জীবন্ত করে তুলেছে।

পদ্মানদীর মাঝি বাংলা সাহিত্যে এক অনুপম সৃষ্টি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম জনপ্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত উপন্যাস। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পিয়ের ফালোঁ এস. জে. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে লিখেছিলেন, "প্রায় কুড়ি বছর আগে, আমি যখন বাংলা শিখতে চেষ্টা করি,তখন স্বভাবত বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'ও আমি তখন পড়েছিলাম। এঁদের সকলের রচনা আমাকে মুগ্ধ করেছিল, এঁদের কবিত্বময় আদর্শবাদিতায় ও রোমান্টিক ভাবধারায় আমার মনকে বিশেষ করে নাড়াও দিয়েছিল। তবু আমার মনের কি-একটা অভাব ও কৌতূহল তখনও পূর্ণ হয়নি। এই সময় একদিন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' আমার হাতে পড়ে। আজও মনে আছে সেদিন প্রাণে একটা রূঢ় আঘাত পেয়েছিলাম। পল্লীজীবনের সেই মাধুর্যপূর্ণ ও ভাবমণ্ডিত চিত্র আর নয়—এখানে পেলাম বাংলার সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনের একটি বাস্তব ছবি, যে ছবির আতিশয্যহীন ও মর্মস্পর্শী পরিচয় আমার দেশের লোকের আছে, আমার ভাষাভাষীদের কাছে দেবার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। পড়া শেষ করে সেই রাত্রেই বইখানির কয়েকটি জায়গা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে ফেললাম। আমার এক ভাইকে সেই অনুবাদ পাঠিয়ে মানিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম।"

তিনি তাঁর বক্তব্যকে আরো স্পষ্ট করে পরে লিখেছেন, "কুবের মাঝির দুঃসাহসিক জীবনের চিত্রাঙ্কন বইয়ের প্রধান আকর্ষণ নয় ; পূর্ববঙ্গের সেই ধীবরপল্লীর জীবনযাত্রার অকৃত্রিম বর্ণনা ও গ্রামবাসীদের সরস কথ্যভাষার অতি সার্থক প্রয়োগ উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণও নয়। সাধারণ মানুষের আদিম ও অমার্জিত মানবতা, অশিক্ষিত ও কষ্টপীড়িত মানুষের চিরন্তন হৃদয়বেদনা ও গভীরতম প্রবৃত্তির অশান্ত সংঘাত, ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ জীবনপরিধির মধ্যেও অপরিচিত ও অনিশ্চিত পরদেশের অনিবার্য আকর্ষণ 'পদ্মানদীর মাঝি' বইখানিতে নিখুঁতভাবে রূপায়িত হয়েছে বলেই এই উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যের ভূমিকায় সার্থকতা অর্জন করেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট চরিত্রগুলি রূপক নয়। কুবের, গণেশ, রাসু, মালা, কপিলা ইত্যাদি মানুষগুলি রক্তমাংসেরই মানুষ। বাস্তব ও জীবন্ত মানুষ। তবে লেখক সত্যকার স্রষ্টা ও শিল্পী বলে ওই সকল চরিত্র সাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি অতিক্রম করে বাস্তবতার সঙ্গে এক গভীর ও সার্বজনীন সাঙ্কেতিকতার সফল সংমিশ্রণ সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। লেখক দার্শনিক না হয়েও প্রকৃত দ্রষ্টা ছিলেন ;

তাঁর সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির গুণে তিনি এ সকল মাঝি-মানুষের অন্তরতম সত্তায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যেখানে তারা আর কেবল পূর্ববঙ্গের দরিদ্র ধীবর তো নয়, বিশ্বজগতের শ্রমকাতর ক্ষুধার্ত পদদলিত নর-নারীর প্রতিনিধি।"

এখানেই 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি অঞ্চলিকতার গণ্ডী অতিক্রম করে বিশ্বজনীন ব্যাপকতায় ব্যাপ্তি লাভ করেছে। নামকরণ থেকেই স্পষ্ট যে এই উপন্যাস পদ্মাতীরের মাঝিদেরই কাহিনি। এই মাঝিদের পরিচয় দিতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

"পদ্মার পারেই কেতুপুর গ্রাম। পূর্বদিকে গ্রামের বাইরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। প্রথম দেখিলে মনে হয় এ বুঝি তাদের অনাবশ্যক সঙ্কীর্ণতা, উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তারপর ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়। স্থানের অভাব এ জগতে নাই, তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই। সবটুকু সমতল ভূমিতে ভূ-স্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে। তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না। একটি কুঁড়ের আনাচে-কানাচে তাহারই নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে আরেকটি কুঁড়ে উঠিতে পায়। পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তারই ফলে জেলে পাড়াটি হইয়াছে জমজমাট।

দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙন ধরা তীরে মাটি কাঁপিতে থাকে, পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধ-শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইঁহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না। এদিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্র-মানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে। ওদিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়া বাজে কন্‌কন্‌। আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি কাড়াকাড়ি করিয়া তাহারা হয়রান হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়। আর দেশি মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

পদ্মা ও পদ্মার খালগুলি ইহাদের অধিকাংশের উপজীবিকা। কেহ মাছ ধরে, কেহ মাঝিগিরি করে। কুবেরের মত কেহ জাল ফেলিয়া বেড়ায় খাস পদ্মার বুকে, কুঁড়োজাল লইয়া কেহ খালে দিন কাটায়। নৌকার যাহারা মাঝি, যাত্রী লইয়া মাল বোঝাই দিয়া পদ্মায় তাহারা সুদীর্ঘ পাড়ি জমায়, এ গাঁয়ের মানুষকে ও গাঁয়ে পৌঁছাইয়া দেয়। এ জলের দেশ।"

জেলেপাড়া এবং জেলেপাড়ার মানুষদের এই পরিচয়ের মধ্যে ফুটে উঠেছে লেখকের আন্তরিকতা, যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত, অবহেলিত, দারিদ্র্যপীড়িত এই নীচুতলার মানুষদের প্রতি সমবেদনা এবং সঙ্গে সঙ্গে আছে বঞ্চনা, অবহেলা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটা ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ। প্রকৃতি এবং মানব সমাজ এদের ধ্বংস করতে চায়। এদের জীবনের

কোন মূল্য নেই। অবাঞ্ছিত এদের জন্ম, মূল্যহীন এদের বেঁচে থাকা। জীবনের মাহাত্ম্য এখানে কিছু নেই, আছে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসা, কাম ও মমতা, স্বার্থ ও সংকীর্ণতা। পদ্মানদীর মাঝিতে আছে তারই পরিচয়।

এ পাড়ার মানুষগুলো জেলে এবং মাঝি। পদ্মার বুকে রাত জেগে ইলিশ মাছ ধরা এবং যাত্রী ও মালবাহী নৌকা চালানো এদের প্রধান জীবিকা। এদের গায়ে শক্তি আছে, বুকে সাহস আছে কিন্তু এদের বাঁচার কোন অধিকার নেই। তাদের সেই অসহায়তার কাহিনি, জীবনযন্ত্রণার আর্তি, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম আর ব্যর্থতার কাহিনি তাদেরই ভাষায় মানিক জীবন্ত করে তুলেছেন। জালে আবদ্ধ ইলিশ মাছের মতোই জেলেদের জীবনের ছটফটানি। পদ্মাতীরের ভাষা নিয়ে এই উপন্যাসে সহমর্মিতায় সার্থক রূপ লাভ করেছে।

এই প্রসঙ্গে রাশিয়ার লেখক ভিলিস লাৎসিস-এর লেখা 'জেলের ছেলে' উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য। 'জেলের ছেলে' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে আর পদ্মানদীর মাঝি প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। জেলের ছেলের পটভূমিকা হল পশ্চিম দার্বগাঙা নদীর মোহনার ঠিক মুখেই একটি ছোট গ্রাম রিনুঝি। এটাও একটি জেলে গ্রাম। এই ধীবর পল্লীতেও বাস করে নিপীড়িত শোষিত জেলেরা আর মৎসজীবীদের শোষক এবং আড়তদার। ১৯৫৩ সালে লাৎসিস আরেকটি উপন্যাস লিখেছেন তার নাম 'সাগর পারের গ্রামখানি'। এই উপন্যাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে। মানিকও ১৯৬০ সালে 'মাঝির ছেলে' নামে আরেকখানি উপন্যাস লিখেছেন। চিনদেশেও জেলেদের জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস আছে। ইতালীতেও আছে। আমেরিকার 'ওল্ড ম্যান এন্ড দি সী' নবেল পুরস্কার খ্যাত। প্রত্যেক দেশের উপন্যাসেই জেলেদের জীবন ও জীবিকার সংগ্রাম, আড়তদার ও নানা শোষকের জুলুমের কথা আছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে উপন্যাস রচনায় চরিত্রচিত্রণে কিছু ভিন্নতা আছে। কিন্তু সবদেশেই জেলের জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাসে তাদের অসহায়তার কথা, অবহেলা ও শোষণের কথা, তাদের কঠোর জীবন সংগ্রামের কথা, তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা, তাদের দুঃখের ইতিবৃত্ত গভীর সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। সেজন্য কোন বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসগুলো রচিত হলেও এগুলোকে আঞ্চলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা উচিত নয়।

পদ্মানদীর মাঝিদের প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র হল কুবের। কুবেরকে নিয়ে এই উপন্যাসের আরম্ভ আর কুবেরের একটা স্পষ্ট পরিণতি দিয়ে এই উপন্যাসের শেষ। কুবের একজন গরীব জেলে। তার নিজস্ব নৌকা নেই, জাল নেই। সেজন্য সারারাত ধরে সে যত ইলিশমাছ ধরে তার অর্ধেক দিতে হয় নৌকা এবং জালের মালিককে। "নৌকাটি ধনঞ্জয়ের সম্পত্তি। জালটাও তারই ; প্রতি রাত্রে যত মাছ ধরা হয় তার অর্ধেক ভাগ ধনঞ্জয়ের বাকি অর্ধেক কুবের ও গণেশের। নৌকা এবং জালের মালিক বলিয়া ধনঞ্জয় পরিশ্রম করে কম।" শরীর ভালো না থাকলেও কুবেরকে মাছ ধরতে যেতে হয়। কারণ শরীরের দিকে তাকাবার অবসর কুবেরের নেই। টাকার অভাবে অখিল সাহার পুকুরটা এবারও সে জমা নিতে পারেনি। সারাটা বছর তাকে পদ্মার উপরই নির্ভর করে থাকতে হয়। এই নির্ভরতাও তার বিশেষ জোরালো নয়। ধনঞ্জয় অথবা যদুর সঙ্গে

সমস্ত বছর তাকে দু-আনা চার-আনা ভাগে মজুরী খাটতে হয়। এতবড় পদ্মার বুকে জীবিকা অর্জন করা তার মত গরীব জেলের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। উপার্জন যা হয় বর্ষাকালে ইলিশের মরশুমে। শরীর থাক আর যাক। এ সময় একটা রাত্রিও ঘরে বসে থাকলে কুবেরের চলবে না। এ অসহায় অবস্থা কেবল কুবেরের নয়, সব জেলেদেরই। কুবেরের জীবনকে কেন্দ্র করে এ উপন্যাস জেলেপাড়ার মাঝিদেরই ইতিবৃত্ত।

সকাল বেলা নদীর তীরে ইলিশ মাছের কেনা-বেচার ধুম পড়ে যায়। আড়তদার তাদের কিছু মাছ তুলে নিয়ে যায়। বিক্রির সময় লক্ষ্য না রাখলে মালিক ধনঞ্জয় তাদের ঠকায়। মাছের তো আর গোনাগুনতি নেই। চারশ মাছ ধরা পড়লেও অনায়াসে তাকে দুইশ সাতপঞ্চাশ খানা বলে চালানো যায়। কুবেরও মাছ চুরি করে জমিদারের নায়েব শীতলের কাছে কম দামে বিক্রি করে। কিন্তু সেও "পয়সা কাইল দিমু কুবের" বলে চলে যায়। রাগে দুঃখে কুবেরের চোখে জল আসে। "গরীবের মধ্যে সে গরীব, ছোটলোকের মধ্যে আরও বেশি ছোটলোক। এমনভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মত, সামাজিক ও ধর্ম সম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মত অসংকোচে গ্রহণ করিয়াছে সে। প্রতিবাদ করিতেও পারিবে না। মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই।" তাদের বাঁচবার অধিকার নেই, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। দিনরাত কেবল একটাই চিন্তা। 'খাওনের চিন্তা'। সেজন্য পুত্রের জন্ম সংবাদ শুনেও কুবের আনন্দিত হয় না। বরং বিরক্ত হয়ে কুবের বলে, "চুপ যা গণেশ, পোলা দিয়া করুম কি? নিজেদের খাওন জোটে না, পোলা!" তবু জৈবিক নিয়মে জেলে পাড়ায় শিশুর ক্রন্দন থামে না। এদের জীবনে যেমন কোন হাঁফ ছাড়বার জায়গা নেই, তেমনি এদের ঘরগুলোতেও কোন আলোবাতাস ঢোকে না।

জেলেপাড়ার মানুষগুলো বড় গবীর। তবু কোন মেলা এলে এদের মনে আনন্দ ধরে না। কুড়ানো ফেলনা জিনিসেই এদের অদ্ভুত আনন্দ। এরা কত অল্পে খুশি। দারিদ্র্যই এদের জীবনের বড় কথা। সেজন্য বিভিন্ন ধর্মের মানুষ হলেও দিনযাপনে এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। হিন্দু মুসলমানে কোন বিরোধ নেই। অতি তুচ্ছ কারণে এদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বাধে আবার অতি অল্পেতেই তাদের ঝগড়া মিটে যায়। "ধর্ম যতই পৃথক হোক দিন-যাপনের মধ্যে তাহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। সকলেই তাহারা সমভাবে ধর্মের চেয়ে এক অধর্ম পালন করে—দারিদ্র্য। বিবাদ যদি কখনও বাধে, সে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিবাদ, মিটিয়াও যায় অল্পেই। কুবেরের সঙ্গে সিধুর যে কারণে বিবাদ হয়, আমিনুদ্দির সঙ্গে জহরের যে কারণে বিবাদ হয়, কুবের আমিনুদ্দির বিবাদও হয় সেই কারণেই। খুব খানিকটা গালাগালি ও কিছু হাতাহাতি হইয়া মীমাংসা হইয়া যায়। মধ্যস্থতা হয়তো করে জহর মাঝিই।"

জেলে পাড়ায় জীবনযাত্রা যেমন ভদ্রলোকদের চেয়ে স্বতন্ত্র, ওদের রসিকতাও তেমনি স্থূল। কার মেয়ে কার সঙ্গে চলে গিয়েছে, কার ছেলে হবে, কারো ছেলের রঙ অত্যন্ত সাদা হয়েছে বলে কানাকানি। এ সব নিয়েই চলে তাদের রসিকতা।

এদের স্বভাব-চরিত্রও ভালো নয়। ফাঁক পেলে চুরিও করে। ঘুমন্ত হোসেন মিয়ার পকেট থেকে কুবের পয়সা চুরি করে। রাসু তার মামা পীতলের টাকাভরা ঘটি সিঁদ কেটে চুরি করে নিয়েছে। কুবেরকেও চুরির দায়ে জেলে পাঠাবার চক্রান্ত হয়েছিল।

কুবের গরীব হলেও বুদ্ধিমান। "সকলের গোপন মতলব সে চোখের পলকে আঁচ করিয়া ফেলে।" তার ঘরে খোঁড়া বউ মালা এবং তিন-চারটে ছেলেমেয়ে। তবু সেখানে তার কোনও অসন্তোষ নেই। মালার বিরুদ্ধে তার কোনও অভিযোগ নেই। সে চিরদিন শান্ত নিরীহ। জেলেপাড়ার অন্য মেয়েদের থেকে সে স্বতন্ত্র। ছেলেমেয়েদের সে ভালোবাসে। সংসার নিয়েই তার জগৎ।

কপিলা তার শ্যালিকা। সে মালার উল্টোপিঠ। ছোটবেলা থেকেই বড় দুরন্ত। যেমন হাসিখুশি, রঙ্গরসিকতায় প্রাণ ভরপুর, তেমনি মজবুত শরীর। বিয়ের পর সে যেন খাঁচার পাখি হয়েছিল। হঠাৎ স্বামীর সঙ্গে কলহ করে বাপের বাড়ি চলে এল। তার স্বামীও রাগ করে আরেকটা বিয়ে করেছে, কপিলাকে সে আর নেয়নি। বাপের বাড়িতে বন্যা হওয়ায় কপিলা এসেছে কুবেরের বাড়িতে। কুবের বুঝতে পারে না "কে জানে কী আছে কপিলার মনে?" কিন্তু তার সেবা শুশ্রূষা, পরিহাস রসিকতা যত্ন সব মিলে কুবেরকে আনমনা করে দেয়। কপিলার "সব বড় রহস্যময় ও দুর্বোধ্য"।

আশ্বিনের প্রবল ঝড়ে জেলেপাড়ার কমজোরী অনেক ঘর পড়ে গেল, অনেক মানুষ মারা গেল। কুবেরেরও ঘর পড়ে গেল। তার মেয়ে গোপীর পা ভেঙে গেল। কপিলা প্রাণ দিয়ে সকলের সেবা করল। কুবের তার কাছে বড় কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল। নানা দুঃখ দৈন্যের মধ্যে কপিলা কুবেরের কাছে খোঁজে একটু শান্তি ও মুক্তির আলো। কুবের আর কিছু চায় না, কপিলার সঙ্গে একটুকু কথা বলে তার বুকের ভারটা যেন একটু হালকা হয়ে যায়। "আর কিছু চায় না কুবের কপিলার কাছে, গোপনে শুধু সুখ-দুঃখের কথা বলিবে। একটু রহস্য করিবে কপিলার সঙ্গে, বাঁশের কঞ্চির মত অবাধ্য ভঙ্গিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কপিলা টিটকারি দিবে তাকে, ধরিয়া নোয়াইয়া দিতে গেলে বসিয়া পড়িবে কাদায়। চাপা হাসিতে নির্জন নদীতীরে তুলিয়া দিবে রোমাঞ্চ।" স্বামী শ্যামাদাসের বদ্ধ খাঁচার থেকে কুবেরের বাড়ি এসে কপিলাও যেন একটু স্বাভাবিক প্রাণ ফিরে পায়।

সেজন্য কপিলা স্বামীর বাড়ি ফিরে গেলেও আবার ফিরে আসে কুবেরের কাছে। কুবেরেরও কপিলা বাপের বাড়ি এসেছে শুনে একবার শ্বশুরবাড়ি যাবার ইচ্ছা জাগে। দু-জনের প্রতি দু-জনের এই আকর্ষণ অতি স্বাভাবিক। জলের সঙ্গে মাছের যেমন সম্পর্ক। তা ছাড়া ওদের মধ্যে মধ্যবিত্তসুলভ রোমান্টিক বিকার নেই, ন্যাকামি নেই।

কপিলা এবং কুবেরের উভয়ের প্রতি উভয়ের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। মালার সঙ্গে কুবেরের যৌন সম্পর্ক। কিন্তু তার বাইরেও মানুষের একটা বড় দাবি আছে, সে দাবি প্রাণের। এই সহজ সম্পর্কের সূত্র ধরেই উভয়ের মধ্যে একটি গভীর আকর্ষণ সৃষ্টি করে। হয়তো রাসুর ষড়যন্ত্রে এবং প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবণতায় কুবেরের ঘরে পীতমের চুরি যাওয়া টাকার ঘটিটা পাওয়া গিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই চৌকিদার-পুলিশ কয়েকবার কুবেরের খবর নিয়ে গিয়েছে। কুবের বাড়ি ফিরলেই তাকে হাজতে যেতে হবে। এই দুশ্চিন্তায় কপিলা কেতুপুরের ঘাটে অত রাত্রে একা দাঁড়িয়ে থাকে। বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে বন্ধুকে সাবধান করা তার কর্তব্য। কপিলা বলে, "আজ বিকালে হঠাৎ পুলিশ আসিয়া বাড়ি তল্লাশ করিয়াছে কুবেরের, ঢেঁকিঘরের পাটখড়ির বোঝার তলে পীতম মাঝির চুরি যাওয়া ঘটিটা পাওয়া গিয়াছে। বাড়ি ফিরিলেই চৌকিদার ধরিবে মাঝিকে।" কুবের কপিলাকে নিয়ে হোসেন মিয়ার কাছে যায়। হোসেন মিয়া

সেই রাত্রেই কুবেরকে ময়নাদ্বীপে যেতে বলে।

"কপিলা চুপি চুপি বলে, না গেলা মাঝি, জেল খাট।"

কুবের বলে, "হোসেন মিয়া দ্বীপে আমারে নিবই কপিলা। একবার জেল খাইটা পার পামু না। ফিরা আবার জেল খাটাইব।"

কুবের দরিদ্র হলেও বোকা নয়। সে বুঝতে পারে তার জীবনের একটি পরিণতি দ্রুত ঘনিয়ে এসেছে। হয় তাকে জেলে যেতে হবে নয়তো তাকে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে যেতে হবে। জেলে গেলেও সে ভবিষ্যতে ময়নাদ্বীপের হাত থেকে, হোসেন মিয়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে না। বাধ্য হয়ে সে হোসেন মিয়ার প্রস্তাবে সেই রাত্রেই ময়নাদ্বীপে যেতে স্বীকার হয়। স্বাভাবিকভাবেই তার পরিবারের কথা মনে হয়েছে। সে জানে তার অবর্তমানে হোসেন মিয়াই তাদের দেখাশুনা করবে। তাদের কোনও অসুবিধা হবে না। অসহায় দরিদ্র কুবের অনিবার্য পরিণতিকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করে নেয়।

কপিলার বাপের বাড়ি আছে, স্বামীর বাড়ী আছে, সেখানে কপিলা বেমানান। কপিলার সহজ স্বাভাবিক প্রকাশ কুবেরকে ঘিরে। সেই কুবের যখন দূরে চলে যায় তখন কপিলার বুক ফেটে একটা আর্তিই বেরিয়ে আসে। "আমারে নিবা মাঝি লগে?" এই একটি কথার মধ্য দিয়া মুখরা পরিহাসরসিকা নারী কপিলার অবরুদ্ধ মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত যে ব্যথা, যন্ত্রণা এবং কান্না লুকিয়েছিল সব যেন এক সঙ্গে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। একে নিছক মামুলী প্রেমের গল্প বলা যায় না। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিত্য পীড়িত দুটি অসহায় মানুষের অব্যক্ত মনের জ্বালা যেন এক সঙ্গে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। একরকম ঔদাসীন্যের সঙ্গেই কুবের সম্মতি দেয়। কপিলাও কুবেরের সঙ্গে ময়নাদ্বীপ চলে যায়।

এই উপন্যাসের হোসেন মিয়া চরিত্রটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। "একটু রহস্যময় লোক এই হোসেন মিয়া।" চেহারা দেখে তার বয়স অনুমান করা যায় না। "পাকা চুলে সে কলপ দেয়, নুরে মেহেদি রঙ লাগায়, কানে আতর মাখানো তুলা গুঁজিয়া রাখে।" তার বাড়ি ছিল নোয়াখালি অঞ্চলে। কয়েক বছর আগে সে কেতুপুরে এসে বাস করছে। "প্রথম যখন সে কেতুপুরে আসিয়াছিল পরনে ছিল একটা ছেঁড়া লুঙ্গি, মাথায় একঝাঁক রুক্ষ চুল—ঘসা দিলে গায়ে খড়ি উঠিত।" জেলেপাড়ার জহরের বাড়িতে সে আশ্রয় নিয়েছিল। "জহরের নৌকায় বৈঠা বাহিত। আজ সে তাহার বেঁটেখাটো তৈল-চিক্কণ শরীরটি আজানুলম্বিত পাতলা পাঞ্জাবিতে ঢাকিয়া রাখে, নিজের পানসিতে পদ্মায় পাড়ি দেয়। জমি-জায়গা কিনিয়া, ঘর বাড়ি তুলিয়া পরম সুখেই সে দিন কাটাইতেছে। গত বছর নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে দু নম্বর স্ত্রীকে।" এইসব সুখের ব্যবস্থা সে যে কী উপায়ে করেছে গ্রামের লোক তা অনুমান করতে পারে না। "নিত্য নূতন উপায়ে সে অর্থোপার্জন করে।" রকমারী ব্যবসা হোসেনের—ধান, পাট, বিড়িরপাতা, তামাক, গুড়, চিনি, মসলা-পাতি, আপিম এবং আরও কত কী! নানাদিকে কত উপার্জন হোসেনের! এর মধ্য অসদ্ উপায়েও অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা আছে। অর্থ উপার্জন করতে হলে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কোনও নীতি বা আদর্শ থাকলে চলে না। নানা ছলে বলে কৌশলে অন্যের পকেট থেকে নিজের পকেটে অর্থ নিয়ে আসার নামই যখন বড়লোক হওয়া তখন হোসেন মিয়া যথার্থ বড়লোক।

"বড় অমায়িক ব্যবহার হোসেনের। লালচে রঙের দাড়ির ফাঁকে সব সময়েই সে মিষ্টি করিয়াই হাসে। যে শত্রু, যে তাহার ক্ষতি করে, শাস্তি সে তাহাকে নির্মমভাবেই দেয় কিন্তু তাহাকে কেহ কোনদিন রাগ করিতে দেখিয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারে না। ধনী-দরিদ্র, ভদ্র-অভদ্রের পার্থক্য তার কাছে নাই, সকলের সঙ্গে তার সমান মৃদু ও মিঠা কথা।" এই উপন্যাসে তার শত্রুর দেখা আমরা পাইনি। ধনী-ভদ্রের সঙ্গে ব্যবহারও আমরা দেখিনি কিন্তু মাঝে মাঝে সে জেলে পাড়ায় যাতায়াত করে। ওদের ভাঙা কুটীরের দাওয়ায় ছেঁড়া চাটাই-এ বসে দা-কাটা কড়া তামাক টানে। জেলে পাড়ার "অর্ধ উলঙ্গ নোংরা মানুষগুলির জন্য বুকে যেন তাহার ভালোবাসা আছে। উপরে উঠিয়া গিয়াও ইহাদের আকর্ষণে নিজেকে সে যেন টানিয়া নীচে নামাইয়া আনে।" তাদের সঙ্গে ব্যবহারে হোসেন মিয়ার যে কোনও কপটতা আছে তা এই গরীব মানুষগুলো ধরতে পারে না। হোসেন মিয়া যা ঘটায় তা সমস্তই স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী।

তবে হোসেন মিয়ার গোপন মতলবের দু-একটা খবর জেলেপাড়ার লোকেরা রাখে। জানা গিয়েছে, নোয়াখালির ওদিকে সমুদ্রের মধ্যে ছোট দ্বীপে প্রজা বসিয়ে সে নাকি জমিদারি পত্তন করছে। কিছু কিছু জঙ্গল সাফ করে এই দ্বীপে হোসেন মিয়া ঋণগ্রস্ত উপবাস-খিন্ন পরিবারদের উপনিবেশ স্থাপন করছে। কেতুপুরের জেলেপাড়ার তিন ঘর মাঝিকে সে যে আদিম অসভ্যযুগের চাষায় পরিণত করেছে সে খবর কারুর অজানা নেই। তার মধ্যে মাত্র এক ঘরের কথাই উপন্যাসে আছে। সেই ঘর রাসুর। রাসু অবশেষে সেই দ্বীপে তার স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যাকে হারিয়ে পালিয়ে কেতুপুরে ফিরে এসেছে। "রাসুর মাথায় বড় বড় চুল জট বাঁধিয়া গিয়াছে, সর্বাঙ্গে অনেকগুলি ক্ষতের চিহ্ন, কয়েকটা ঘা এখনও ভালো করিয়া শুকায় নাই।" এই দ্বীপের নাম ময়নাদ্বীপ।

অতএব এই উপন্যাসটি আরম্ভ হয়েছে হোসেন মিয়া আর ময়নাদ্বীপ সম্পর্কে একটি আতঙ্ক নিয়ে। এ নিয়ে জেলেপাড়ায় একটি বিচারসভাও বসে। আশ্চর্য, সেখানে অভিযুক্ত হোসেন মিয়াই যেন বিচারক। সভা শেষে হোসেন মিয়াই রাসুকে বলে একবার তার বাড়িতে যেতে। রাসুর উপর হোসেন মিয়ার কোন রাগ নেই। বরং সে বলে, "পয়সাকড়ি পাইবা মালুম হয়, নিকাশ নিয়া খারিজ দিমু। ময়নাদ্বীপির জমিন না নিলি জঙ্গল কাটনের মজুরি দিই—খাওন-পরন বাদ।" "লালচে দাঁড়ির ফাঁকে হোসেন মিয়া মৃদু মৃদু হাসে, বলে মনে করতিছ, হোসেন মিয়া ঠক। তোমারে ঠকাইয়া হোসেন মিয়ার পয়দা কিসির? কোন হালারে জবরদস্ত ময়নাদ্বীপি নিছি? আপন "খুশিতে গেছিলা, ঝুট না কলি মানব রাসু বাই। ফিরা আইবার মন ছিল, আমারে কইবার পারলা না? একসাথ আইতাম?"

হোসেন মিয়া এই উপন্যাসে বারবার বলেছে, "জান দিয়া তোমাগো দরদ করি।" সেই দরদের বহু পরিচয় আছে। কুবেরের ঘরের চালে খড় নেই। দেখতে পেয়ে হোসেন মিয়া নিজেই কুবেরকে খড় দেয়। আশ্বিনের প্রবল ঝড়ে জেলেপাড়ার অধিকাংশ ঘরবাড়ি পড়ে গেলে হোসেন নিজেই এগিয়ে আসে তাদের সাহায্যে। গ্রামের জমিদার মেজ কর্তাও এই দুর্দিনে এসেছিলেন। তার সভাপতিত্বে একটা সভা হল। চাঁদা তোলার ব্যবস্থা হল। নিজে দিলেন দশ টাকা আর গ্রাম থেকে উঠল পনের টাকা। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে নন্দ ভট্টাচার্যকে দেওয়া হল সাত টাকা, জেলে পাড়ার জন্য দেওয়া হল দশ টাকা, দু টাকা করে পাঁচ জনকে। কিন্তু হোসেন মিয়া সে ধরনের সাহায্য দিল না। "ঘুরিয়া ঘুরিয়া

সে চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া বেড়াইল, তারপর দাড়ি নাড়িয়া বলিল, না, টাকা কর্জ দিমু না, ছন দিমু, বাঁশ দিমু, নিজে খাড়াইয়া তোমাগো ঘর তুইল্যা দিমু—শ্যাযে নিকাশ নিয়া খত লিখুম। একটা কইরা টিপ দিবা।" সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থায় এই টিপ দিয়েই কৃষকরা মরে। দিনে দিনে এই খতের টাকা সুদে আসলে মিলে এমন হয় যখন আর তার বাঁচার উপায় থাকে না। কিন্তু হোসেন মিয়ার সেই রকম কোনও মতলব ছিল না। সে বলে, "টিপসই দিয়া রাখ, যখন পারবা দিবা,—না দিলি মামলা করুম না বাই!...জান দিয়া তোমাগো দরদ করি, খত কিসের? লিখা থুইলাম, হিসাব থাকব—না-ত কিসির কাম খত দিয়া?"

তবু কুবের হোসেনকে ভয় করে। কারণ তার মনের কথা কেউ জানে না। লোকটা সব সময় নিজের মতলবে থাকে। "কোন স্বার্থ সাধিবার জন্য কবে কাকে হোসেন মিয়ার প্রয়োজন হয় তাই শুধু কেহ জানিতে পারে না।" সেজন্য কুবের হোসেন মিয়ার নৌকায় কাজ করতেও ভয় পায় অথচ অস্বীকার করবে এমন উপায়ও নাই। অবশ্য ময়নাদ্বীপ ছাড়া হোসেনের আর কোনও মতলবের কথা জানা যায়নি।

অথচ হোসেন চিরকাল এমনটি ছিল না। একদিন সে কুবের গণেশ জহরের মতো মাঝি ছিল। নিপুণ দক্ষ মাঝি। "হোসেন মিয়া যে কত বড় দক্ষ নাবিক, দিকচিহ্নহীন সমুদ্রের বুকে তাহার নৌকা পরিচালনা দেখিয়াই তাহা" কুবের বুঝতে পেরেছিল।

আরও একটা গুণ আছে হোসেনের। সে মুখে মুখে ছড়া বাঁধতে পারে। অনেক দিন আগে কুবেরের মতো ছেঁড়া কাপড় পরে আধপেট খেয়ে যখন সে জলে কাদায় দিন কাটাত তখন সকাল সন্ধ্যায় তার মনে ভেসে আসত গানের চরণ। জীবনে ভিন্ন অবস্থায় পড়লে সে হয়তো কয়েকটি গীতিকা রচনা করত, তার মধ্যে এক একটি মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে তাকে অমর গ্রাম্যগীতিকার রূপে খ্যাত করে দিত। গানের ভিতর হোসেনের নাম দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ত। লোকে হয়তো বলত, "হোসেন ফকির, চল কেতুপুরে দেওয়ান ফকির হোসেন ছাহাবের দরগায় চেরাগ জ্বালি।"

কিন্তু না, সেদিকে হোসেন গেল না। হোসেনের নেশা শুধু ময়নাদ্বীপ। এগার মাইল লম্বা একটা দ্বীপ। এই রহস্যময়দ্বীপের কথা কুবের পাঁচ ছয় বৎসর ধরে শুনে আসছিল। একবার সে নিজে সেই দ্বীপ প্রত্যক্ষ করল। জমি অত্যন্ত নীচু। "জলার ধারে খানিকটা ধানের জমি করা হইয়াছে, বিস্ময়কর ফসল ফলে। জলায় ও চারিদিকের জঙ্গলে অসংখ্য সাপ আছে, কিন্তু জানোয়ার কিছু নাই, রাসু বাঘ-সিংহের গল্প করিয়াছিল, সেটা নিছক গল্পই।"

হোসেন মিয়ার উপনিবেশে লোকসংখ্যা একশর কম নয়। তার তিন ভাগই প্রায় ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, যারা অধিকাংশ এই দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছে। "ম্যালেরিয়া ও সাপের সঙ্গে লড়াই করিয়া এখনো হোসেন জয়লাভ করিতে পারে নাই, জঙ্গলের সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম চলিয়াছে ; অনেক খাদ্য এখানে উৎপন্ন করা যায় না, জীবনের অনেক প্রয়োজন মিটাইতে সমুদ্রপথে পাড়ি দিতে হয় সভ্য জগতের দিকে। অবিশ্রাম খাটুনি এখানে, অসংখ্য অসুবিধা এখানে, জীবন এখানে নির্মম ও নীরব"। তাই রাসুর মতো অনেকে হয়তো পালিয়ে গিয়েছে। তবু এখানে যে মানুষগুলো আছে তাদের হোসেন অনেক উপকার করেছে। "আমিনুদ্দি অপরিশোধ্য আর্থিক ঋণেই শুধু আবদ্ধ নয়,

হোসেন না দিলে এ জীবনে স্ত্রী কি আর তাহার জুটিত—নছিবনের মতো স্ত্রী? রসুলকে জেলের দুনিয়া হইতে ছিনাইয়া নিয়া আসিয়াছে হোসেন, দেশে ফিরিলে জেলেই হয়তো তাহাকে ঢুকিতে হইবে। প্রতিদানে হোসেন আর কিছুই তাদের কাছে চায় না, তারা শুধু এখানে বাস করুক, স্বপ্ন সফল হোক হোসেনের।"...এটাই হোসেনের একমাত্র মতলব। "জঙ্গল কাটিয়া যত জমি তারা চাষের উপযোগী করিতে পারিবে সব তাদের সম্পত্তি, খাজনা বা চাষের ফসল কিছুই হোসেন দাবি করিবে না। নিজেদের জীবিকা তাহারা যতদিন নিজেরাই অর্জন করিতে পারিবে না, জীবিকা পর্যন্ত যোগাইবে হোসেন। গৃহ ও নারী, অন্ন ও বস্ত্র, ভূমি ও স্বত্ব সবই তো পাইলে তুমি, এবার শুধু খাটিবে ও জন্ম দিবে সন্তানের।" জোর-জবরদস্তি নেই, অন্যায় সে কারুর প্রতি করে না। কুবের হোসেনের ভাবভঙ্গি দেখে অবাক হয়ে যায়। "কী প্রতিভা লোকটার, কী মনের জোর। যেখানে যত ভাঙাচোরা মানুষ পায় কুড়াইয়া নিয়া জোড়াতালি দিয়া নিজের দ্বীপে রাজ্য স্থাপন করিতেছে—প্রজাবৃদ্ধির ব্যবস্থার দিকে তাহার সজাগ দৃষ্টি। হোসেনের উদ্দেশ্যই হয়তো তাই, আমিনুদ্দির মত জীবন-যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হতাশ ও নিরুৎসাহ মানুষগুলিকে আসলে তাহার প্রয়োজন নাই, ওরা তাহার দ্বীপটি যে নবীন নরনারীতে ভরিয়া দিবে, সে তাহাদেরই প্রতীক্ষা করিয়া আছে।"

উপনিবেশ পত্তনের কথা আমরা জানি। প্রথমদিকে চাষিদের জোর করে এনে অনাবাদী জমি উদ্ধার করা হয় তারপর বহুগুণে শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি করে নিয়োজিত অর্থেরও বেশি আদায় করা হয়। এটাই জমিদারি নিয়ম। হোসেনের কিন্তু সে রকম কোন মতলবের কথা এখানে নেই। সে অর্থ ও ভূমিস্বত্ব সবই চাষিদের জোগায়। অন্য শোষক এবং জমিদারের সঙ্গে এখানে তার পার্থক্য। রকমারী ব্যবসা করে এবং নানা অসৎ উপায় অবলম্বন করে হোসেন অর্থ উপার্জন করে। তবু "টাকাওয়ালা মানুষের সঙ্গে মেশে না হোসেন, তাদের সঙ্গে সে শুধু ব্যবসা করে, মাল দিয়া নেয় টাকা, টাকা দিয়া নেয় মাল। মাঝিরা তাহার বন্ধু।" অবসর সময় সে পাড়ার দীন-দরিদ্র মাঝিদের সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দেয়। সে হয়তো তার অতীত দিনগুলোকে একেবারে ভুলতে পারে না। নিজের এবং তাদের দারিদ্র্য এবং অসহায়তার জ্বালা থেকেই হোসেনের মনে হয়ত নতুন দ্বীপের স্বপ্ন জাগে। সেখানে ভাঙাচোরা মানুষদের নিয়ে সে এক নতুন সমাজ গড়ে তুলতে চায়। যেখানে খাটার, পরিশ্রম করার আর সেই শ্রমের ফসলের উপর শ্রমজীবীর সম্পূর্ণ অধিকার। সেখানে ধর্মের কোনও ভেদাভেদ নেই। তাই হোসেন ময়নাদ্বীপে মোল্লাপুরুতকে নিয়ে যায়নি। মন্দির মসজিদ করেনি। "মুসলমানে মসজিদ দিলি, হিন্দু দিব ঠাগুরঘর—না মিয়া, আমার দ্বীপির মদ্যি ও কাম চলব না।" এটাই হোসেনের মনের কথা। হোসেনের মুখে কুবের শোনে, "নীলামে দ্বীপটি কিনিবার পর ওখানে জনপদ বসানোর স্বপ্ন দেখিতেছে সে, জীবনে আর তার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নাই, কামনা নাই,—হাজার দেড়েক মানুষ ওখানে চলাফেরা করিতেছে, এক বিঘা জমিও দ্বীপের কোনওখানে অকর্ষিত নাই, মরিবার আগে এইটুকু শুধু সে দেখিয়া যাইতে চায়। কত অর্থ ও সময় সে ব্যয় করিয়াছে দ্বীপের পিছনে। ময়নাদ্বীপের নেশা পাইয়া না বসিলে আজ তো সে বড়লোক।" এই জন্যই তার আরো আরো অর্থ চাই। সেই অর্থোপার্জনের জন্যই সে সৎ অসৎ উপায় বিবেচনা করে না।

এখানে হোসেন মিয়ার সঙ্গে অন্য বড়লোক মেজকর্তার পার্থক্য। ভালো করবার খেয়ালে বড়লোক কখনো গরীবের হৃদয় জয় করতে পারে না। সেজন্য মেজোকর্তা জেলে পাড়ায় গেলে নানা কথা ওঠে, নানা বদনাম রটে কিন্তু হোসেন মিয়ার সম্পর্কে তা খাটে না। "জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে একদিন মেজবাবুর যাতায়াত ছিল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যনীতির জ্ঞান বিতরণ করিয়া মাঝিদের জীবনগুলি উন্নততর করিবার ঝোঁকে তিনি আভিজাত্য ভুলিয়াছিলেন। শিক্ষা মাঝিরা পায় নাই, মাঝিদের বউ-ঝিরা শুধু পাইয়াছিল দুর্নাম, গ্রামে গ্রামে খবর রটিয়াছিল যে কেতুপুরের মেজকর্তা জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে রমণী চাখিয়া বেড়াইতেছেন।... মাঝিরা বিব্রত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ভালো করিবার খেয়ালে বড়লোক কবে গরিবের হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছে? মেজবাবু তো হোসেন মিয়া নন। দুর্নীতি, দারিদ্র্য, অন্তহীন সরলতার সঙ্গে নীচু স্তরের চালাকি, অবিশ্বাস ও সন্দেহের সঙ্গে একান্ত নির্ভয়, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অধর্মকে অনায়াসে সহিয়া চলা—এসব যাদের জীবনে একাকার হইয়া আছে। পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়া যারা ভাবুক কবি, ডাঙায় যারা গরিব ছোটলোক, মেজবাবু কেন তাদের পাত্তা পাইবেন? ও কাজ হোসেন মিয়ার মত মানুষের পক্ষে সম্ভব, মেজবাবুর চেয়ে বেশি টাকা রোজগার করিয়াও যার মাঝিত্ব খসিয়া যায় নাই।" তাই মাঝিরা হোসেন মিয়াকে যেমন বিশ্বাস করতে পারে তেমন মেজোকর্তাকে পারে না।

হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপকে সমাজতন্ত্র বলা যায় না ঠিকই। কিন্তু কঠোর দারিদ্র্য, নিষ্ঠুর প্রকৃতি ও নির্মম সমাজের প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে যে কাল্পনিক শ্রমনির্ভর সমাজের কথা মনে পড়ে ময়নাদ্বীপের মধ্যে সেই কাল্পনিকতারই সার্থক প্রকাশ। হোসেন মিয়ার চরিত্রের মধ্যে এবং তার স্বপ্ন ময়নাদ্বীপের মধ্যে ত্রিশ দশকের মন্দা, বেকারি, দারিদ্র্যের জ্বালায় অস্থির মধ্যবিত্ত মানসিকতায় বিকল্প জীবনাদর্শেরই সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

মানিক সত্যই কুবের গণেশ মালা কপিলাকে ভালোবেসেছিলেন বলে তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা ও পরম আত্মীয়তায় তাদের রূঢ় অসভ্যতা, নৈতিক দুর্বলতা, দোষগুণ নিয়ে তারা এই উপন্যাসে অপরূপ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাদের ভাঙাচোরা জীবন নিয়েই একটি আদর্শ জনপদ গড়ার স্বপ্ন ময়নাদ্বীপে মূর্ত হয়ে উঠেছে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর গুজরাটে নগরপত্তনের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এক সুস্থ এবং জনপদ গড়ার আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্বজগতের শ্রমজীবী ক্ষুধার্ত পদদলিত নরনারীর স্বপ্নেরই সার্থক রূপকার মানিক।

কাহিনি রচনায়, পরিবেশ বর্ণনায়, চরিত্র রূপায়ণে পদ্মানদীর মাঝি পূর্বেকার গল্প উপন্যাস থেকে পরিণত। কিন্তু এখনো মানিকের দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা এবং জীবনদর্শনের স্পষ্টতা পূর্ণরূপ লাভ করেনি। হোসেন মিয়া এবং তার ময়নাদ্বীপ পাঠকের নিকট অস্পষ্ট এবং রহস্যময়। ময়নাদ্বীপ যদি জেলে-মাঝিদের নতুন স্বর্গ হয়ে থাকে তাহলে সেখানে কুবেরকেও কৌশলে নিয়ে যেতে হয় কেন? হোসেন মিয়া তার মতলবের মতোই শেষ পর্যন্ত পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য থেকে গিয়েছে। এক এক সময় তাকে মনে হয়েছে কামুক, শঠ, আবার এক এক সময় মনে হয়েছে উদার, সাধারণের হিতৈষী। আবার এক সময় মনে হয়েছে হোসেন মিয়া ময়নাদ্বীপের মধ্যে মানুষের জন্য সুন্দর জগৎ সৃষ্টি করতে

চেয়েছেন। সেখানে ধর্মের বিরোধ থাকবে না। শ্রেণি ভেদাভেদ থাকবে না। সবাই এক মানুষ জাতি—খেটে খাওয়া কৃষক হবে। সব মিলিয়ে হোসেন মিয়া এক অপূর্ব সৃষ্টি। কুবের-কপিলার সম্পর্কও রহস্যময়।

বাধ্য হয়ে কুবের তার স্ত্রী-পুত্র কন্যাকে ফেলে কপিলাকে নিয়ে ময়নাদ্বীপে পাড়ি দিল। এখানেও সেই জৈবিক ষড়যন্ত্রের কাহিনি মনে হতে পারে। কিন্তু যাবার আগে কুবেরের মনে পড়ল তার স্ত্রী পুত্রের কথা। তবু, পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে অজানা জীবনের পরিচয় এবং জেলে-মাঝিদের জীবনের বাস্তব কাহিনি বাংলা সাহিত্যের পাঠককে এক নতুন জগতের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিল এবং এই কাহিনি রচনায় মুন্সীয়ানার জন্য মানিক সমাদৃত হলেন। পুতুল নাচের ইতিকথার শশী আর পদ্মানদীর মাঝির হোসেন মিয়ার মধ্যে মানিকেরই যেন আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। শশীর মতো মানিক গাওদিয়ার জীবনকে গভীরভাবে ভালোবেসেছেন, তাদের সুখ দুঃখে গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছেন আর হোসেন মিয়ার মতো ভালোবেসেছেন পদ্মানদীর মাঝিদের। তাদের জন্য গড়তে চেয়েছেন এক শ্রেণিহীন কৃষক সাধারণের নতুন দ্বীপ। সেই দ্বীপ সম্পর্কে প্রশ্ন থাকলেও সাধারণ জেলে মাঝিদের প্রাত্যহিক জীবন, প্রকৃতি এবং শোষণের বিরুদ্ধে তাদের অসহায় সংগ্রাম, নানা দোষ ত্রুটি নিয়েই তাদের বাস্তব জীবনবেদ বাংলা উপন্যাসের পাঠককে এক নতুন দিগন্তে উপনীত করেছে। সেখানেই এই উপন্যাসের সবচেয়ে বড় সার্থকতা।

১৯৩৬ সালের শেষ দিকে প্রকাশিত হয় **'জীবনের জটিলতা।'** এই উপন্যাসও মানিক-প্রতিভার প্রথম পর্বের রচনা। এখানে আছে মধ্যবিত্ত জীবনে প্রেমের জটিলতা, বেকারত্ব এবং দারিদ্র্যের জ্বালা।

উপন্যাসের কাহিনিটি হল : বিমল ও প্রমীলা দু ভাই বোন। তাদের পাশের বাড়িতে থাকে অধর আর তার স্ত্রী শান্তা। বিমল কবিতা লেখে। শান্তা তার প্রতি অনুরক্ত হয়। বিমল কিন্তু ভালোবাসত লাবণ্যকে আর নগেন ভালোবাসে প্রমীলাকে। ভালোবাসার টানাপোড়নে লাবণ্য বিমলের জীবন থেকে সরে যায়। বিমলও শান্তার প্রতি অনুরক্ত হয়। নগেন লাবণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অধর হঠাৎ শান্তার প্রেমে অধীর হয়ে ওঠে। সে শান্তাকে তার প্রেমের পুতুলের মতো ব্যবহার করে। শান্তা অস্থির হয়ে ওঠে। তার মন পড়ে আছে বিমলের দিকে। অধর ঠিক করে তারা এই বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে। যাবার আগের দিন শান্তা বিমলের সঙ্গে দেখা করতে আসে। বিমল পাগলের মতো শান্তাকে প্রেম নিবেদন করে। অধর তার বাড়ি থেকে সবই দেখতে পায়। শান্তা বাড়ি ফিরলে সে তাকে ছাতে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাকে লাফিয়ে পড়ে মরবার জন্য প্ররোচিত করে। শান্তা ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে। মুমূর্ষু অবস্থায়ও সে বিমলের জন্য ছটফট করে। বিমলের জানালার পাশে তার জানালা। সেখানে এসে বসে। শেষে শান্তা মারা যায়। অধর প্রথম প্রথম মদ খেয়ে পড়ে থাকত। পরে বিমলদের বাড়ি এসে বিমলের বাবা প্রমথর সঙ্গে আলাপ করে দাবা খেলে। শেষে প্রমীলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। প্রমথ সানন্দে রাজী হয় কিন্তু বিমলের অমত। বিমল শান্তার রক্ত মাখা ব্যান্ডেজটাকে স্মৃতিরূপে বালিসের তলায় রেখে দেয়।

একদিন প্রমীলা শান্তার জন্য বিমলকে অভিযোগ করে। সে বলে, "যে কীর্তি তুমি